—ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ—

বাংলা গদ্যের ইতিহাস

প্রাক্-বিনয় সরকার পর্ব

North Bengal University
Library
Raja Rammohunpur

প্রাক্-বিনয় সরকার পর্ব

সকল প্রাণীর কণ্ঠেই শব্দ আছে। কিন্তু মুখের ভাষা বলতে আমরা যা বুঝি—তা একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মুখে নেই। মানুষ তার আপন বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিত্য প্রয়োজনের সমস্ত জিনিষ তৈরী করে নিয়েছে। ঐ মস্তিষ্ক-ক্ষমতা বলেই সে মুখের ভাষাটিও সৃষ্টি করেছে। তবে এই ভাষা তৈরী করতে লেগেছে বহু-কাল। প্রথমে এই মূর্তিটা ছিল অমার্জিত। ক্রমে শব্দের ভান্ডার বেড়েছে, উচ্চারণ স্পষ্ট হয়েছে, বাক্য অনেক অর্থবহ হয়েছে।

ভাষার এই শৈশব কাটতে লেগে গেছে কয়েক হাজার বছর। সাহিত্য রচনার কথা তখন লোকে ভাবেনি। সাহিত্য জিনিসটা শখের। সংসারের অত্যাবশ্যকটুকু নিয়েই তখন মানুষ ব্যস্ত। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলি অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ সম্পর্কে যখন একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে—তখনই তার হাতে অবসর এসেছে। অবসর সময়ে তার মনে নানা শখের উদয় হয়েছে—মূর্তি গড়েছে, কাঠ খোদাই করেছে, পাথরের গায়ে ছবি এঁকেছে অর্থাৎ নানা রকমের শিল্পকলার জন্ম হয়েছে। সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলাও একটা শখ—এর থেকেই সাহিত্যের সৃষ্টি।

সাহিত্যের যোগ্য হতে ভাষার লেগে গেছে কয়েক হাজার বছর। সাহিত্যের কাজে লাগাতে গিয়ে ভাষাকে শোধন করে নিতে হয়েছে। আদিযুগের সাহিত্য-শাস্ত্রীরা ভাবতেন ছন্দোবদ্ধ, ঘননিবদ্ধ, সুসজ্জিত ভাষাই—সাহিত্যের ভাষা। সকল দেশে, সকল ভাষা—ছন্দোবদ্ধ পদ্যে ভর করেই সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। লেখক-পাঠক সকলে পদ্যকেই সাহিত্যের বাহন বলে জেনেছে। গদ্যকে এ কাজের যোগ্য বলে ভাবতে পারেনি। গদ্য জিনিষটা নিত্য প্রয়োজনের, তাকে পোশাকি কোন কাজে লাগানো যাবে না। ফলে সাহিত্যের অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার না পেয়ে তাকে বহির্দ্বারে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকদিন।

ইংরাজী সাহিত্যেও এই একই অনাদরের কাহিনী লক্ষণীয়। সেখানেও পদ্যের জন্ম আগে, গদ্য পরে। ইংরাজী সাহিত্যে—পদ্য এবং গদ্যের মর্যাদার ব্যবধান ছিল যথেষ্ট। ইংরাজী গদ্যের সাবালক হতে চারশ বছর লেগে গিয়েছে—যেখানে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র দু'শ বছর। ইংরাজী গদ্যের বয়স এখন ছ'শ বছর। অর্থাৎ ইংরাজী গদ্যের তুলনায় বাংলা গদ্যের অগ্রগতি অনেক দ্রুত গতিতে হয়েছে। অর্থাৎ অতি স্বল্পকালের মধ্যে সে অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে।

আদিযুগের বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ধর্মপ্রধান ছিল। যদিও সেখানে মানব মূল্য অস্বীকৃত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজের আগমনের ফলে বাঙালীর জীবনধারায় ও ভাবধারায় যে পরিবর্তন ঘটল, তার প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্যে। ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালী তার সাহিত্যের অপূর্ণতার প্রতি সচেতন হয়। সাহিত্যে আধুনিকতার পথ পরিষ্কৃত হয় ইংরেজী শিক্ষা ও নবমানসিকতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে।

উনবিংশ শতকের আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল—পত্র, দলিল এবং কড়চায়। এর পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত। বাংলা গদ্যের প্রথম প্রয়োজন বোধ করে ইংরেজরা। তাদের উদ্যোগেই বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রথম রচিত হল। বাঙালীর জন্য বাংলা গদ্যের জন্ম হয় নি, হয়েছে ইংরেজের জন্য। ইংরেজরা অনুভব করেছিল— এ দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করতে পারলে বাণিজ্য ও রাজকার্য—দুয়েরই পরিচালনা সহজ হবে। কিন্তু ভাষাশিক্ষা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, কারণ গদ্যভাষায় রচিত কোন বাংলা পুস্তকই তখন ছিল না। নিজের গরজে ইংরেজকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হল। এছাড়া আরও একটা তাগিদ ছিল। খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য মিশনারী সাহেবরা গদ্য ভাষায় বাংলা পুস্তকের প্রয়োজন অনুভব করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, উইলিয়ম কেরী প্রমুখ মিশনারী সাহেবদের উদ্যোগেই ১৮০০ সালে 'গসপেল অব সেন্ট ম্যাথু'র বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'মথি লিখিত সুসমাচার' প্রকাশিত হয়। এরও আগে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত— আইন কানুন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছিল। এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন কিন্তু বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইংরেজ পন্ডিত। অর্থাৎ ১৮০০ সাল অবধি বাংলা গদ্যে বাঙালীর কোন অবদান নেই।

উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনার প্রয়াস হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। ১৮০০ সালে এই কলেজ স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশের সামাজিক রীতিনীতি, দেশীয় ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করানো। ব্যবস্থাপনার ভার পড়েছিল উইলিয়ম কেরীর ওপর। তিনি দেশীয় পন্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রধান সহকারী দুজন ছিলেন রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার। এঁদের রচনায় কতগুলি রীতিঘটিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

উইলিয়ম কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানা বসল। তিনি শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে বাইবেলের অনুবাদ করিয়েছিলেন বা করেছিলেন। তবে তার ভাষা ইংরেজি সাহিত্যের বাক্য-বিন্যাস রীতির দ্বারা প্রভাবিত। উইলিয়ম কেরীর নামে যে দুটি বই প্রচারিত হয়েছিল—তার গদ্যরীতি অনেকটা মার্জিত। বই দুটির নাম 'কথোপকথন' (১৮০১ খ্রীঃ) ও 'ইতিহাস মালা' (১৮১২ খ্রীঃ)। 'কথোপকথন' গ্রন্থটিতে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং আচার ব্যহারের আলোচনা আছে। একজন ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে যথাসম্ভব চলিত ভাষায় বাক্যালাপের ঢং-এ বইটি লেখা। এর মধ্যে হরেক রকমের জিনিস ঠাঁই পেয়েছে। এমনকি স্ত্রীলোকের কোন্দলও। মানুষের মুখের ভাষা এখানে গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণের বোধগম্য ভাষার দ্বারাও যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়—তা কেরী দেখিয়েছেন। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই বইটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গদ্য ভাষার জন্ম হতে না হতেই বৎসরকাল মধ্যে চলিত ভাষার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা বড় কথা। উইলিয়ম কেরীর দ্বিতীয় বই 'ইতিহাসমালা'য় অনেকগুলি ছোট বড় গল্প গৃহীত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশই চলিত দেশি গল্প। এর ভাষা অনেক উন্নত। বাইবেল অনুবাদের আড়ষ্টতা এখানে নেই।

রামরাম বসুর গ্রন্থের সংখ্যা দুটি—'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রীঃ) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২ খ্রীঃ)। 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটি—বাংলা গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। তিনি ফারসী মিশ্রিত গদ্য রচনা করেছিলেন। অনেক পরস্পর বিরোধী কর্তাকে একই ক্রিয়ার কাঁধে চাপিয়ে নানা গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'লিপিমালা'—চিঠির আকারে লেখা নানা বিষয়ের আলোচনা। এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত অন্বয়ের দোষ পরিহার করে প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করতে পেরেছিলেন—ফারসি শব্দকোষের আশ্রয় নিতে হয়নি তাঁকে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের গদ্যরীতির বিকাশ দেখা যায়। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেছিলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'রাজাবলি'। 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থে চলিত ভাষার দৃষ্টান্তও আছে—তবে সংস্কৃতানুসারী দৃষ্টান্তই বেশী। 'রাজাবলি' ইতিহাসমূলক গ্রন্থ। ইতিহাসের বিরাট মহত্ত্ব—মৃত্যুঞ্জয়ের ধারণায় আসেনি। সংস্কৃত প্রধান বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক ছন্দকৌলিন্য এখানে প্রথম দেখা দিয়েছে মনে হয়। 'রাজাবলি'তে মৃত্যুঞ্জয়ের যে কলাকৌশলের উদ্ভব দেখি, 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' দেখি তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। তিনটি বিশিষ্ট গদ্যরীতি অনুসৃত হয়েছে—কথ্যরীতি, সাধুরীতি এবং সংস্কৃতানুসারীরীতি। 'হিতোপদেশ', 'বেদান্তচন্দ্রিকা' ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাবলী সংস্কৃত অনুগামী ছিল। তাঁর রচনারীতিতে পন্ডিতির ছাপ প্রবল ছিল। তাঁর সংস্কৃত প্রধান গদ্যভাষা—ভাব কল্পনার সঙ্গে ভাষাসম্পদের তাল রক্ষা করে এগিয়ে চলেছিল। তাঁর হালকা চালের সংলাপী ধরণের সাধুরীতি দেখা যায়—'প্রবোধচন্দ্রিকায়'। সাধুভাষার মধ্যে চলতি ইডিয়ম ও বাক্‌রীতি ভাষাকে নাটকীয় করে তুলেছে। চলতি গ্রাম্য শব্দকে—বিচক্ষণতার সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। বিষয়ানুসারী ভাষার রীতি হাল্‌কা, গম্ভীর বা মধ্যমগতি করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর ভাষা স্বচ্ছন্দ ও গতিবান্ হয়েছে।

বাংলা গদ্যের জন্ম অতি শুভ-লগ্নে। লগ্নের অধিপতি স্বয়ং রামমোহন রায়। একজন মহামনস্বী ব্যক্তি—তাঁর কর্মে-বাক্যে-চিন্তায়, ব্যক্তিত্বের মহিমায় চতুর্দিকে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন—তার সঙ্ঘাতে সমগ্র সমাজ ব্যগ্র-ব্যস্ত-উচ্চকিত হয়ে ওঠে। যে ভাষার মুখে বাক্য ছিল না, সেও মুখর হয়ে ওঠে। রামমোহন যেদিন বেদান্তসূত্র বাংলা গদ্যে অনুবাদ করলেন, সেদিনই আমাদের গদ্য—শক্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির নিগূঢ়তম তত্ত্বকে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচার বাংলাদেশে এক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন। সমাজে প্রচন্ড তোলপাড় ঘটেছে, ঘোরতর বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ভাষা ও সাহিত্য—দু'এরই পুষ্টি সাধন হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। কিন্তু রামমোহন এই কলেজি রচনার সীমানার বাইরে বাংলা গদ্যকে নিয়ে আসলেন। তাঁর গ্রন্থগুলি হল 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫ খৃঃ), 'বেদান্তসার' (১৮১৬ খৃঃ), 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৮ খৃঃ), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮ খৃঃ), 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮ খৃঃ), 'পণ্যপ্রদান' (১৮২৩ খৃঃ), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১ খৃঃ), 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১ খৃঃ), 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খৃঃ) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যে দুটি রীতি আছে সাধু এবং চলিত, তারই কথা রামমোহন রায় 'বেদান্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই সকল রীতির—ভাষা উপকরণ ছিল না, তাই এর প্রয়োগের সমস্যা ছিল তাঁর পক্ষে। বাক্যের শেষে

ক্রিয়া স্থাপন করেছেন আবার অনেক ক্ষেত্রে উহ্য রেখেছেন। ব্যাকরণ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'গৌড়িয় ব্যাকরণ' গ্রন্থে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃতজ উপাদান প্রচুর আছে। কিন্তু বাংলা ভাষার উচ্চারণ রীতি বা রূপ নির্মাণ রীতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। তাঁর ভাষায় বৈজ্ঞানিকজনোচিত বাক্‌সংযম ছিল। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম লেখক, যিনি তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে সর্বসাধারণ পাঠকের সঙ্গে সহিতত্ত্বের মেলবন্ধনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন।

মিশনারি সাহেবরা যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে সচেষ্ট, তখন যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁদের মতবাদ খন্ডন করেছেন। রচনার মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর যুগ-সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করে তাদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন। তিনি বিপক্ষের বিরুদ্ধে কটূক্তি প্রয়োগ না করে সংযম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শালীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই কৌশল—বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছেন।

১৮১৮ খৃঃ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রে এই বাংলা গদ্যের চর্চা অব্যাহত ছিল। এই সকল রচনার ভাষা বৈশিষ্ট্যই ছিল বাংলা গদ্যের প্রাথমিক স্তরের বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পন' প্রকাশিত হয়। প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনার মত—প্রথম সাময়িক পত্রের প্রকাশও ইংরেজের উদ্যোগেই হয়েছিল। সাধারণ জীবনযাত্রা এবং ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ যথাসম্ভব অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। সাময়িক পত্রিকাগুলির বাংলা ভাষাতে—এই ভাষা-বৈশিষ্ট্য ছিল।

এরপর বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় পর্যায়—'তত্ত্ববোধিনী' (১৮৩৯ খৃঃ)-র যুগ শুরু। প্রধানতঃ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে এযুগের সমৃদ্ধি। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয় কুমারের 'ভূগোল'—প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল— শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় 'সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা' (১৮৪৫ খৃঃ), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫১ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৫৩ খৃঃ), 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ ১৮৫৩ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৫৪ খৃঃ, ৩য় ভাগ ১৮৫৯খৃঃ), 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫ খৃঃ), 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ' (১৮৫৫ খৃঃ), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬ খৃঃ), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৮ খৃঃ), এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ভাগ ১৮৭০ খৃঃ, ২য় ভাগ ১৮৮৩ খৃঃ)।

'ভূগোল', 'চারুপাঠ' এবং 'পদার্থবিদ্যা' পাঠ্যপুস্তকের জন্য রচিত হলেও, অন্যান্য গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনে রচিত হয়নি। ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গদ্য রচনার জন্য তিনি শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বিষয়কে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য তিনি বাংলা গদ্যের কৃতি শিল্পী। ভূগোল, বিজ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত ছিল—জি. টি. পিয়ার্সনের 'ভূগোল' ও 'জ্যোতিষ বিষয়ক প্রস্তাব' পড়ে তাকে মিথ্যা বলে মনে করতেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মালো। মানবধর্মাচরণকে একমাত্র সত্য বলে মানলেন।

বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব অক্ষয়কুমারের। কিন্তু বাংলা গদ্য রচনা করতে গিয়ে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—তা হল শব্দ নির্বাচনের। কারণ তাঁর সামনে বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ খাড়া ছিল না। ইংরেজী অনেক শব্দের বাংলা পরিভাষা ছিল না। তিনি এই সকল শব্দগুলি নির্মাণ করলেন। এই পরিভাষাগুলি এখনও কিছু অবিকৃত আছে। তাঁর সংযোজিত শব্দগুলি স্বতন্ত্র শব্দে পরিণতিলাভ করেছে। যেমন—'পরমসুখ', 'জলকল্লোল', 'বৃক্ষসমূহ' ইত্যাদি। তিনি অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশী করেছেন। বাক্যবিন্যাসে দেখা গেছে—তিনি দীর্ঘ রীতিতে বাক্য রচনা করেছেন। দীর্ঘরীতিতে সম্পন্ন বাক্যে বক্তব্যের পারম্পর্য নষ্ট হয়নি। তাঁর ভাষা কখনও পান্ডিত্যপূর্ণ, কখনও সঙ্গীতময় হয়েছে—তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাতেও সঙ্গীতের সুর শুনিয়েছেন।

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার আর একজন লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা গদ্যের সৌষ্ঠব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচনাগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) ধর্মসাহিত্য, (২) পত্রসাহিত্য, (৩) জীবনীসাহিত্য। তাঁর গ্রন্থগুলি হলঃ—'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ' (১৮৫০ খৃঃ), ঐ বঙ্গানুবাদসমূহ (১ম এবং ২য় ভাগ) (১৮৫১ খৃঃ), 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' (১৮৮২ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (১৮৬০ খৃঃ), 'পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ - - - বক্তৃতা' (১৮৬১ খৃঃ), 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা' (১৮৬২ খৃঃ), 'মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ' (১৮৬০-৬৭ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ১ প্রকরণ

(১৮৫১ খৃঃ) ২ প্রকরণ (১৮৬৬ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্মের পরিশিষ্ট' (১৮৮৫ খৃঃ), 'ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী' (১৮৬৪ খৃঃ), 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' (১৮৬৪ খৃঃ), 'ব্রাহ্মধর্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি' (১৮৬৫ খৃঃ), 'ভবানীপুর ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ' (১৮৬৫-৬৬ খৃঃ), 'উপহার' (১৮৮৭ খৃঃ), 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' (১৮৯৩ খৃঃ), 'পরলোক ও মুক্তি' (১৮৯৫ খৃঃ), 'পত্রাবলী' (১৮৫০-১৮৮৭ খৃঃ), 'আত্মচরিত' (১৮৯৮ খৃঃ), ইত্যাদি।

ধর্মকে গদ্য সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করার কৃতিত্ব দেবেন্দ্রনাথের। তাঁর কাছে ঈশ্বরবোধ আর জীবনবোধ—দ্বৈতাদ্বৈতরূপে প্রকাশিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সব প্রবন্ধ ও উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হয় তা গ্রথিত হয় 'অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্যা'য়।

তাঁর সাহিত্যধর্মী পত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিক খুলে দেয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'র আদর্শ দেবেন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য থেকেই পেয়েছেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'আত্মজীবনী' (১৮৯৪ খৃঃ)। 'আত্মজীবনী'র ভাষায় বাংলা গদ্যের অপূর্ব রূপ দেখা যায়। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের রচনায় অধ্যাত্মবোধই স্থায়ী সুর। তাঁর গদ্যরীতি বিষয়শাসিত। বিদেশী শব্দ বিশেষতঃ ইংরেজী শব্দের ব্যবহার—তাঁর রচনার চলৎশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাস ব্যবহারে তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি অনেকসময় ক্রিয়াকে উহ্য রেখে বাক্য তৈরী করেছেন। এতে রচনার সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। ভাষার মধ্যে সঙ্গীতসৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী। 'তত্ত্ববোধিনী সভা', (১৮৩৯ খৃঃ), 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০ খৃঃ), এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩ খৃঃ)-র মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেগুলি বেশীর ভাগই ধর্মসাহিত্য। তাঁর এই সকল গ্রন্থগুলি সঙ্গীত-সুধায় ভরপুর ছিল।

'তত্ত্ববোধিনী' যুগের আর একজন মনস্বী ও যুক্তিবাদী লেখক বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা তখনকার অন্য কোন গদ্য লেখকের ছিল না এবং যার জন্য তিনি তখনকার গদ্য লেখার মামুলি ঢঙকে অবিকল অনুকরণ করার প্রেরণা বোধ করেননি। তাঁর সমগ্র রচনা মোটামুটি চার শ্রেণীর। (১) অনুবাদমূলক রচনা, (২) শিক্ষামূলক রচনা (৩) সমাজসংস্কার মূলক রচনা, (৪) মৌলিক রচনা।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর হিন্দী 'বেতালপচ্চিশি'র অনুসরণে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' লেখেন। সাহিত্যে যাকে সাধুভাষা বলে— তার পরিচয় এই রচনাতে পাওয়া যায়। প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন। মূল সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' থেকে তিনি বাংলায় 'শকুন্তলা' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। বাগভঙ্গীতে লঘুরীতি ব্যবহার করেছেন। ভাষা এখানে স্বচ্ছন্দ হয়েছে। তাঁর একটি অনুবাদগ্রন্থ শেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors'-এর অনুসরণে 'ভ্রান্তিবিলাস' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। মূল কমেডির হাস্যতরঙ্গ ও লঘু ধরণটি তিনি সুন্দরভাবে তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ভবভূতির 'সীতার বনবাস' বিদ্যাসাগরের হাতে অনেক সহজ হয়েছে। তিনি এখানে ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। সীতার শোচনীয় পরিণাম বোঝাতে তিনি করুণ রসের একটু বেশী স্থান দিয়েছেন।

তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে 'বোধোদয়' (১৮৫১ খৃঃ), 'কথামালা' (১৮৫৬ খৃঃ), 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৮ খৃঃ), 'বর্ণমালা' (১ম ও ২য় ভাগ) প্রভৃতি অন্তর্গত। ভাষার বাঁধুনি-গাঁথুনির প্রথম পাঠ পাওয়া গেছে 'বোধোদয়', 'কথামালা'র পাতায়। এর ভাষারীতি অতি পরিচ্ছন্ন ও সংযত।

তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৫ খৃঃ), এবং 'বহুবিবাহ বন্ধবিষয়ক রচনাদি' (১৮৭১-১৮৭২ খৃঃ)। তাঁকে নানা বিষয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। তাঁর যুক্তিবাদী ভাষা, তীক্ষ্ণ-তুখোড়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই ধরণের গ্রন্থে। যুক্তির বাঁধুনি থাকার জন্য তাঁর ভাষা শিথিল হয়ে পড়েনি। বাংলা গদ্যের গোড়াটা মজবুত হয়েছিল এই কারণে যে—প্রথমেই ভাষাকে কঠিন কাজে লাগানো হয়েছিল বলে। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা গদ্যে সাহিত্যের স্বাদ এনেছিলেন।

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—'আবার অতি অল্প হইল' এবং 'অতি অল্প হইল' (১৮৭৩ খৃঃ), 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' (১৮৮৮ খৃঃ), 'ব্রজবিলাস', 'বিধবাবিবাহ', 'যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' (১৮৮৪ খৃঃ), 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬ খৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি। এই গ্রন্থগুলি সাধুরীতিতে লেখা হলেও এখানে বাগভঙ্গী হালকা রীতির হয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি স্ল্যাং শব্দও ব্যবহার করেছেন। বহু চলতি শব্দের সংকলন তিনি করেছেন।

বিদ্যাসাগর অতি নিপুণ হাতে ভাষার অবয়বটি তৈরী করে দিয়েছিলেন। তাঁর গদ্যের প্রতিটি শব্দ বলবান ও সুনির্বাচিত। বাংলা গদ্যের প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃত উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। বিষয় অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। যখন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন বা কোন গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তখন তাঁর রচনায় সংস্কৃতের ভাষাগত প্রভাব বেশী পড়েছে। আবার যখন সাধারণ বিষয় বা শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তখন সেখানে সরলপদ সৃষ্টি করেছেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে তিনি নামধাতু প্রয়োগ করেছেন। 'বলিয়া' বা 'এই বলিয়া' যোগে ব্যাক্যারম্ভ তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে গদ্যভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন—তাঁর ছাঁদটি সাহিত্য রচনাকার্যের ছাঁদ। ফলে তাঁর গদ্য শিল্পশ্রী মন্ডিত গদ্য হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী ও অনুরাগী রাজনারায়ণ বসু সে যুগের এক কৃতী লেখক। তাঁর 'সেকাল ও একাল' আজও সুখপাঠ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত হয়েও ইংরাজি শিক্ষার গুণে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২ খৃঃ), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২ খৃঃ) ইত্যাদি গ্রন্থে স্বচ্ছন্দ গদ্য রচনায় কুশলতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন।

এতদিন বাংলা গদ্য চলছিল বিদাসাগর প্রদর্শিত পথে। হঠাৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ ক্ষুদ্রকায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। লোকে যে ভাষায় কথা বলে, লিখন-পাঠনের ভাষাকে যতটা সম্ভব তার কাছাকাছি নিয়ে আসাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। অল্পশিক্ষিত লোককে সহজবোধ্য ভাষায় সাহিত্যরস যোগান দিত এই পত্রিকা। প্যারীচাঁদ মিত্র বহু রচনা করেছেন যেমন—'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', 'রামরঞ্জিকা' (১৮৬০ খৃঃ), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫ খৃঃ), 'অভেদী' (১৮৭১ খৃঃ), 'অধ্যাত্মিকা' (১৮৮০ খৃঃ) ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি প্রধানত 'আলালের ঘরে দুলাল' গ্রন্থের লেখক হিসাবে। 'আলালের ঘরে দুলাল' (১৮৫৮ খৃঃ, ১৮৫৪ খৃঃ থেকে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত) প্রকাশের পর সাহিত্যে কোন রীতিটি গৃহীত হবে—তা নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। সাধারণ লোকের মুখে প্রতিদিনের কথাবার্তায় যে সব কথা হরদম চলছে, সেই সব শব্দ বা ভাষা তিনি তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগে এবং সংলাপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ক্রিয়াপদের কাঠামো সাধুভাষার মত হয়েছে—অর্থাৎ 'খাচ্ছি', 'এলুম', 'গেলুম' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন নি। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাধুভাষার সঙ্গে কথ্যভাষার মিশেল দিয়ে ভাষার মধ্যে সরসতা বাড়িয়েছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬১-৬২ সালে প্রকাশিত হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'। এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তখনকার কলকাতার সামাজিক জীবনের একটি ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র। অল্প শিক্ষিত কলকাতা-বাসিন্দাদের মুখের 'কলকাত্তাই' বুলিতে লিখিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি নতুন পদ্ধতির গদ্যরীতির সৃষ্টি করলেন। এর ভাষা অনেক বেশী কথ্যধর্মী।

এতদিনে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য দুই-ই পরিণতির পথে অগ্রসর হল। কিন্তু ভাষা সবল হলেও সেখানে লালিত্যের অভাব ছিল। কঠিন বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করেছে কিন্তু রসের কথা বলতে শেখেনি। ভাষা—রসিকের ভূমিকা নিলে, তবেই তা সাহিত্যের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। বাংলা ভাষা সাহিত্যের দীক্ষা গ্রহণ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে। বঙ্কিমের হাতে ভাষার দেহ-সৌষ্ঠব যে ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বিস্ময়কর।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ ১৮৬৫ সালে। যে ভাষায় প্রথম গদ্যগ্রন্থের প্রকাশ ১৮০১ সালে—সে ভাষায় মাত্র চৌষট্টি বছরের পার্থক্যে উপন্যাস রচিত হল। ইংরেজী ভাষায় গদ্যের জন্ম যেখানে চতুর্দশ শতকে, সেখানে উপন্যাসের জন্ম অষ্টাদশ শতকে হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার যেখানে চৌষট্টি বছর লেগেছে ইংরাজি সাহিত্যের সেখানে সাড়ে তিনশ বছর লেগেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতি যে কি দ্রুত গতিতে হয়েছে এখানেই তার প্রমাণ।

বঙ্কিমচন্দ্র সামনে কোন আদর্শ রেখে কাজ করেন নি। দেশী, বিদেশী নানা গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু এই সকল সাহিত্য থেকে তিনি কোন রীতি গ্রহণ করেন নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের কিছু বিশেষ উপাদান তাঁর মনের ভিতর জমা ছিল। কল্পনা সর্বস্ব রচনার রীতি—বঙ্কিমের উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

তিনি মানুষের জীবন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সংঘাত ঘটে আবার সংঘাত ব্যক্তির চিত্তে ঘটে। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাসেই দেখা যায়—উপকাহিনী চিত্তাকর্ষক হয়েছে। উপন্যাসে পত্র ব্যবহার বঙ্কিমের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। ঘটনাবহুল উপন্যাসে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনকে মহাকবির দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র এই দৃষ্টি প্রসারিত।

তাঁর উপন্যাসগুলি হল—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খৃঃ), 'কপালকুন্ডলা' (১৮৬৬ খৃঃ), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খৃঃ), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খৃঃ), 'ইন্দিরা' (১৮৯৩ খৃঃ), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৩ খৃঃ), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খৃঃ), 'রজনী' (১৮৭৫ খৃঃ), 'রাধারানী' (১৮৭৫ খৃঃ), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খৃঃ), 'রাজসিংহ' (১৮৯৩ খৃঃ), 'আনন্দমঠ' (১৮৯৪ খৃঃ), 'দেবীচৌধুরানী' (১৮৯৫ খৃঃ), 'সীতারাম' (১৮৯৮ খৃঃ)।

তাঁর রচনার ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা। তিনি মনে করতেন, লোকে যে ভাষা বোঝে—সেই ভাষায় রচনা করা উচিৎ। কিন্তু বাস্তবে তিনি এই নীতি মেনে চলতে পারেন নি।

'কপালকুন্ডলা'র সংস্কৃত ঘেঁষা শব্দাড়ম্বর বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বর্জন করেন। সংলাপে সংস্কৃত, ওড়িয়া, হিন্দী, ইংরেজী, ফার্সী ব্যবহার করতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখা গেছে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত একাধিক উপন্যাসে দেখা যায়। যেমন—'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের শৃঙ্খলিত ব্যবহার—তাঁর রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

বাংলাগদ্যের বাঙালীসুলভ লাবণ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রণয়কাহিনী যেমন রচনা করেছেন—তেমনি ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাও প্রচুর করেছেন। এখানেও ভাষার প্রাঞ্জলতা ক্ষুন্ন হয়নি। বঙ্কিমের বহুমূল্যবান প্রবন্ধ—বিচিত্র চিন্তার এক মহামূল্য ভান্ডার। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়টি 'কৌতুক ও রহস্য' প্রবন্ধ 'লোকরহস্য' নামে পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয় ১৮৭৪ সালে। 'লোক রহস্যে'র কৌতুকরসের মধ্যে বিদ্রূপ না থাকার জন্য এটি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫ খৃঃ) তাঁর সাহিত্যশিল্পের একটি অভিনব সৃষ্টি। প্রবন্ধ ও নক্শাগুলিতে বুদ্ধির দীপ্তি এবং অনুভূতির গভীরতা আছে। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৭৯ খৃঃ) একটি ব্যঙ্গগল্প। বিজ্ঞানবিষয়ক নয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয় 'বিজ্ঞানরহস্য' নামে। এই প্রবন্ধগুলি সহজ ভাষায় লেখা। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' (১৮৭৬ খৃঃ) এবং দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রবন্ধ পুস্তক' (১৮৭৯ খৃঃ) নামে সঙ্কলিত হয়েছিল।

বঙ্কিমের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর স্তম্ভে এক জ্যোতিষ্কমন্ডলী গদ্য-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হল। অক্ষয়চন্দ্র

সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখরা 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক। বাংলা গদ্যের সমৃদ্ধিতে এঁরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' মাসিক পত্রের সম্পাদক হিসাবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি ও তাঁর সরস মনোভাবটির আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ, যথা—'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৪ খৃঃ), 'আলোচনা' (১৮৮২ খৃঃ), 'সনাতনী' (১৯১১ খৃঃ) ও 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩ খৃঃ) প্রভৃতিতে জ্ঞানগম্ভীর ও কল্পনারস—এই দুই রীতিরই নিদর্শন মেলে। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, সরস ও ঋজুগতির—উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিকের অনেক গুণই তাঁর ছিল।

চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১ খৃঃ), 'ত্রিধারা' (১৮৯১ খৃঃ), 'সাবিত্রী তত্ত্ব' (১৯০০ খৃঃ) সেকালে খানিকটা সমাদর লাভ করেছিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'পালামৌ' (১৮৮০ খৃঃ) ঠিক প্রবন্ধ নয়, মুখ্যতঃ ভ্রমণকাহিনী, তবে এর মধ্যে উপন্যাস ও প্রবন্ধের কিছু কিছু উপাদান দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ শিষ্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বঙ্কিমচন্দ্র সহজ ও সরল ভাষায় গুরুতর প্রবাদ লিখতে উৎসাহিত করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্ব এবং বাংলা ও সংস্কৃতের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী

ছিলেন। তাঁর 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯ খৃঃ) উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদি হিন্দুযুগের জীবনযাত্রার ছবি এঁকেছেন। 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১ খৃঃ) নামক পৌরাণিক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২ খৃঃ) বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে।

বঙ্কিম বাংলা গদ্যকে এমন এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যেখানে দিগন্ত অবধি সমস্ত পথই তার কাছে উন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ এসে একটি সাজানো বাগান হাতে পেলেন। এতে তাঁর কাজে সহায়তা হয়েছে আবার দায়িত্বও বেড়েছে। 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ কুড়ির দশকে বিশ্ব নাগরিকে পরিণত হয়েছিলেন। তার ছাপ পড়েছে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। ফলে বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি বেড়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কাব্যিয়ানা নেই। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য ও স্বাদবৈচিত্র্য ফোটাতে তিনি যে বিশেষ শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন, তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' প্রকাশিত হয় (১৮৭৭-৭৮ খৃঃ)। কিন্তু এতে ততটা পরিপক্কতা নেই বলে তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' (১৮৮৩ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে তিনি ক্রমে উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ওপর প্রত্যক্ষ অধিকার অর্জন করেন। 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে (১৯৮৭ খৃঃ)—বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার ইতিহাসের কাহিনী অনুসৃত হয়েছে।

এই দুইখানি উপন্যাসের পর অনেকদিন রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা থেকে বিরত ছিলেন। 'চোখের বালি' (১৯০২ খৃঃ) ও 'নৌকাডুবি' (১৯০৬ খৃঃ) তাঁর পরবর্তী উপন্যাস। এই অন্তবর্তীকালে তিনি ক্রমশঃ কাব্যপরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই সময় ১৮৯১ খ্রীঃ থেকে তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প, মাসিক পত্রিকায় অনুশীলন করে—অপরূপ সৌন্দর্য সুষমায় একে সমৃদ্ধ করে তোলেন। জীবনের বিচিত্র রূপ রসের নতুন অভিজ্ঞতা—তাঁর পরবর্তী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রকাশিত হল। 'চোখের বালি'তে মনোবিশ্লেষণের বৈপ্লবিক নূতনত্ব সঞ্চারিত হল। এই উপন্যাসটিতে এক বাস্তব সংঘাতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর মধ্যে যে কাব্যানুভূতি আছে তা চরিত্রগুলিকে স্বচ্ছতর করতে সাহায্য করেছে। 'চোখের বালি'র কয়েক বছর পরে ১৯০৬ সালে 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত হয়। এখানে মানুষের চরিত্র অপেক্ষা ঘটনারই প্রাধান্য। এই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মতা রক্ষিত হয়নি। এটি একটি রোমান্স আশ্রয়ী ঢিলেঢালা ধরণের উপন্যাস।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বাজাত্যবোধ—ধর্মবিরোধ ও রাজনৈতিক চেতনার আঘাতে, বাঙালী জীবন আন্দোলিত হয়েছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এক বিশালতর পটভূমিকায় জীবনের বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে এসে দাঁড়াল। 'গোরা' (১৯০৯ খ্রীঃ) উপন্যাসে বিরাট পটভূমিকার প্রভাব লক্ষণীয়। আকারে-প্রকারে, ভাবে-আদর্শে 'গোরা' মহাকাব্যের মতই বিশাল। 'গোরা'তে মানবিক পরিবর্তন ও যথার্থ ভারতীয়ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটিকে নাটকীয় মুহূর্তে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। 'গোরা'তে তিনি সমগ্র সমাজের—দেশব্যাপী নানা ভাব আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র এঁকেছেন। 'গোরা'-র পরে যে সমস্ত উপন্যাস রচনা করলেন তাদের মধ্যে সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবির পরিবর্তে আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের সমাবেশ তৈরী করলেন। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬ খৃঃ), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬ খৃঃ), 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খৃঃ), 'শেষের কবিতা' (১৯৩০ খৃঃ), 'দুইবোন' (১৯৩৩ খৃঃ), 'মালঞ্চ' (১৯৩৪ খৃঃ), ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪ খৃঃ) উপন্যাসগুলি এক নতুন রীতি, শিল্পকৌশল ও জীবন-সমীক্ষা অবলম্বনে লিখিত। তাঁর ভাষা তীক্ষ্ম ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষারীতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। তাঁর ১১৯টি গল্প—১৮৮৪ খৃঃ থেকে ১৯৪১ খৃঃ, এই মোট সাতান্ন বছর ধরে রচিত হয়েছিল। এত দীর্ঘ সময় কোন লেখকের ব্যক্তিগত শৈলী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হওয়ার পর—রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যরীতি ত্যাগ করে, চলিত রীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে একটি বিশেষ ব্যঙ্গের 'এফেক্ট' তৈরী করতে—'তোতাকাহিনী'তে আবার সাধুভাষার আশ্রয় নেন। নিজ প্রয়োজনেই, ভাষার শক্তিবৃদ্ধির কথা তাঁকে সারাক্ষণ ভাবতে হয়েছে। এত বিভিন্ন ও এত বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তাঁকে লিখতে হয়েছে যে, বিষয়ভেদে ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে তাঁকে সজাগ থাকতে হয়েছে।

'স্ত্রীর পত্র'-তেই রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগ করেছিলেন। পত্রের আকারে লিখেছেন বলেই হয়ত চলিত গদ্যে লেখার কথা মনে হয়েছিল। চিঠির সহজ ভাষা চলিত গদ্য। তাই 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রের আকারে লেখা বলে সেখানে চলিত রীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাই এরপরেই রবীন্দ্রনাথ 'ভাইফোঁটা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১, আশ্বিন) গল্পে সাধুরীতির গ্রহণ করেছেন। 'পয়লা নম্বর' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) গল্পেই তিনি পাকাপাকিভাবে চলিত রীতি গ্রহণ

করেন। এই সকল গল্পগুলি 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশ করেছিলেন। 'সবুজপত্র'-তে মোট দশটি গল্প পকাশ করেছিলেন 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'হৈমন্তী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'বোষ্টমী' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'স্ত্রীর পত্র' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'ভাইফোঁটা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'শেষের রাত্রি' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'অপরিচিতা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ), 'তপস্বিনী' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), 'পয়লা নম্বর' এবং 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রভাবিত থাকলেও পরের দিকে বঙ্কিমের গদ্যরীতি পরিহার করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধরণের অতিনাটকীয়তাকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় স্থান দেননি। তার সমাজ ও পারিবারিক গল্পগুলিতে—সমাজ ও জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে। 'একরাত্রি', 'দুরাশা', 'মধ্যবর্তিনী' প্রভৃতি গল্পে প্রেম, সৌন্দর্য ও কল্পনার বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি গল্প অতি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি; যেমন—'কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার', 'রাসমণির ছেলে', 'ছুটি', 'দিদি', 'ঠাকুরদা' ইত্যাদি। 'নষ্টনীড়' আকারে বড় হলেও, এটি প্রকারে ছোটগল্পের জাত। মনোবিশ্লেষণমূলক এই গল্পটি অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে উদার বিশাল প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের নিগূঢ় সম্বন্ধ গীতিকবিতার আকারে ফুটে উঠেছে। তাঁর কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত গল্প 'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি' আধুনিক জীবনের সমস্যার অবতারণা করেছে। 'মণিহারা', 'নিশীথে' গল্প দুটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশের মধ্যে ভৌতিক রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যের চাইতে রবীন্দ্রগদ্যের বিকাশ ও পরিণতি অনেক বেশি দ্রুত। মাত্র সতের-আঠার বছর বয়সে কলম ধরেই 'য়ুরোপ প্রবাসী পত্র' নামক গ্রন্থে যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা কোন কাব্যগ্রন্থেই পাওয়া যায় না। 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯১ খৃঃ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ—দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়। নানা বিষয়ক প্রবন্ধ সম্ভারে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭ খৃঃ), 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪ খৃঃ), 'বিচিত্রপ্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গ কৌতুক' প্রভৃতি সমালোচনা গ্রন্থ (সবই ১৯০৭ খ্রীঃ প্রকাশিত), ১৪ খন্ডে লেখা 'শান্তিনিকেতন', 'প্রবন্ধ সমষ্টি', 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২ খৃঃ), 'ছিন্নপত্র' (১৯১২ খৃঃ), 'জাপানযাত্রী' (১৯১৯ খৃঃ), 'যাত্রী' (১৯২৯ খৃঃ), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (১৯৩০ খৃঃ), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১ খৃঃ), 'জাপান-পারস্যে' (১৯৩৬ খৃঃ), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬ খৃঃ), 'কালান্তর' (১৯৩৭ খৃঃ), 'পত্রধারা' (১৯৩৮ খৃঃ), 'সভ্যতার সঙ্কট' (১৯৪১ খৃঃ)—এই সকল গদ্য তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যে সাধু ও চলিত—এই দুই ভাষাশৈলীই লক্ষিত হয়। সাধুরীতি থেকে চলিত রীতি গ্রহণের একটি মধ্যবর্তী পর্ব তৈরী হয়েছে। এই সময়ে তাঁর গদ্যরীতি, সাধুরীতির আবরণে থাকলেও—ভঙ্গি ও শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে চলিতরীতির অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। 'রাসমণির ছেলে', 'হালদার গোষ্ঠী', 'পণরক্ষা', 'চতুরঙ্গ', 'জীবনস্মৃতি' সাধুভাষায় লেখা হলেও এই বইগুলিতে প্রথম থেকেই পাওয়া যায় চলতি ভাষার নির্ভর স্বাচ্ছন্দ্য।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য বহুরূপী। একই সময়ে, একই সঙ্গে, দুরকম ভাষায় লিখেছেন—'গল্পগুচ্ছ' সাধুভাষায়, 'ছিন্নপত্র' চলিত ভাষায়। প্রবন্ধ যখন লিখছেন কোন বিশেষ সমস্যা নিয়ে—তখন তাঁর ভাষা যুক্তিতর্কের আঁট বাধুনি হয়েছে। আবার 'বিচিত্র প্রবন্ধে' সেই লেখনীরই রাশ আলগা করেছেন। 'চার অধ্যায়', 'শেষের কবিতা'-র চকচকে ক্ষুরধার ভাষা ঠিক স্বাভাবিক নয়—কৃত্রিম। তবে ভাষার বাক্-চাতুর্য্য তিনি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন তা তাঁর নিজস্ব ভাষা, প্রাকৃতজনের ভাষা নয়। চলিত ভাষা—পথ, ঘাট, বাজারের ভাষা। কিন্তু খাঁটি, নির্জলা, চলিত ভাষার ব্যবহার বিবেকানন্দ করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'বর্তমান ভারত' (১৩০৫-৭ বঙ্গাব্দ), 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ), 'পরিব্রাজক' (১৩০৭-৮ বঙ্গাব্দ), 'পত্রাবলী' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি গুণগত উৎকর্ষে ঋজু, কঠিন। বিবেকানন্দ ঊনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু চিঠিপত্র ও দুচারটি প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর গদ্য রচনার সবটুকুই মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত। মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

সাহিত্যসৃষ্টি—বিবেকানন্দের রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। নিজের মনের কথা ও চিন্তাকে গুরুভাইদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র ঐ কয়েকটি গ্রন্থে। চলিতরীতি ছাড়া সাধুরীতিকেও ক্লাসিকধর্মী রূপ দিয়েছেন, তা তাঁর 'বর্তমান ভারত'-এ লক্ষ্য করা যায়। সমাজতাত্ত্বিকের নিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের মধ্যে সেতু আবিষ্কার করেছেন। এখানে তিনি দু-ধরণের বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। একটি তৎসম শব্দবহুল আর একটি হাল্‌কা বাক্‌রীতি। সমাস-সংবদ্ধ চিন্তার বাহন তাঁর সাধুভাষায় লক্ষ্য করা যায়। অনেক জায়গায় চলিত রীতিতে ইডিয়মেরও প্রভাব দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিবেকানন্দের ভাবের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারী শুনে বুঝলেন, মুখের ভাষা কেমন করে উপমায়-শব্দচয়নে অসামান্য ভাষা হয়ে উঠতে পারে। বাংলা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলা গদ্যের রূপান্তর সাধনে 'উদ্বোধনে'র প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটি এবং 'বর্তমান ভারত' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি একদিকে ও অন্যদিকে 'ভাববার কথা', 'বিলাত যাত্রীর পত্র' (পরিব্রাজক) পাশাপাশি রাখা যায়। প্রথমটিতে সাধুরীতি নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়টিতে তিনি দেশী, ঘরোয়া শব্দে মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় পরিণত করেছেন। এর মধ্যেও মাঝে মাঝে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'তে বিশুদ্ধ মুখের বুলি ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপের ধরণ-ধারন মুদ্রাদোষগুলিও প্রয়োগ করেছেন। তাঁর চলিত রীতি অত্যন্ত জীবন্ত। চলিত ভাষার পক্ষপাতী হয়েও প্রয়োজনস্থলে আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর বিবৃতিধর্মী চলিতগদ্যে তাত্ত্বিক ও তথ্যগত বিবৃতি লক্ষ্য করা যায়। আবার চলিত ভাষার মধ্যে তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। চলিত বাংলার নাগরিক ইডিয়ম তাঁর রচনায় যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। চলিত ভাষাতে বিদগ্ধ ভব্যরূপ না দিয়ে, তাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে তাতে ওজঃ রস সঞ্চার করেছিলেন তিনি। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘুতাই যে চলিতরীতি নয়, তা বিবেকানন্দ ভাল করে জানতেন। বাংলা গদ্য গঠনে তিনি অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের উদয়ের ফলে চারিদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে 'কুন্তলীন' পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'মন্দির' শরৎচন্দ্রের রচনা। ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' নামে একটি বড় গল্প প্রকাশিত হলে তার অপূর্বত্বে সেদিনের পাঠক সমাজ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। বাইশ বৎসরের মধ্যে তিরিশখানি উপন্যাস ও গল্প সংকলন পাঠকসমাজের ওপর প্রভাব পড়েছিল। ১৯৩৮ খৃঃ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর 'শুভদা' প্রকাশিত হয়। 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ রেখেই তাঁর মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট রচনাটি রাধারানী দেবী সম্পূর্ণ করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র আদর্শবাদী, রোম্যান্টিক ঔপন্যাসিক। তিনি সমাজের অখ্যাত বিবর্ণ চরিত্রগুলিতে অসাধারণত্ব আরোপ করেছেন। ফলে এই সকল চরিত্রগুলি পাঠকের মনে অক্ষয় স্থান অধিকার করেছে। তাঁর কিছু উপন্যাসে পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে কোন সামাজিক নীতিঘটিত প্রশ্ন নেই। যেমন—'বিন্দুর ছেলে' (১৯১৪ খৃঃ), 'পরিণীতা' (১৯১৪ খৃঃ), 'পন্ডিত মশাই' (১৯১৭ খৃঃ), 'মেজদিদি' (১৯১৫ খৃঃ), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬ খৃঃ), 'বৈকুন্ঠের উইল' (১৯১৫ খৃঃ), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬ খৃঃ), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭ খৃঃ) ইত্যাদি। তিনি তথাকথিত সমাজের আদর্শকে না মেনে, সমাজের অবিচারের চাপে পিষ্ট সেই সকল নরনারীর বেদনাতুর কাহিনী লিখে শিক্ষিত উচ্চবর্ণের সমাজে আঘাত হেনেছিলেন। সেই সকল উপন্যাসগুলি হল 'বড়দিদি' (১৯১৩ খৃঃ), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪ খৃঃ), 'শ্রীকান্ত' (১ম-১৯১৭ খৃঃ, ২য়-১৯১৮ খৃঃ, ৩য়-১৯২৭ খৃঃ, ৪র্থ-১৯৩৩ খৃঃ), 'দেবদাস' (১৯২৭ খৃঃ), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭ খৃঃ), 'গৃহদাহ' (১৯২০ খৃঃ), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩ খৃঃ), 'শেষপ্রশ্ন' (১৯৩১ খৃঃ) ইত্যাদি। নীতি ও তত্ত্বকথা যেখানে প্রচার করেছেন সেখানে শিল্পরস ক্ষুন্ন হয়েছে। যেমন—'পথের দাবি' (১৯২৬ খৃঃ), 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১ খৃঃ), 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫ খৃঃ) ইত্যাদি। 'স্বামী' (১৯২৮ খৃঃ), 'কাশীনাথ' (১৯১৭ খৃঃ), 'দর্পচূর্ণ' (১৯১৫ খৃঃ), 'নববিধান' গল্পগুলিতে দাম্পত্য বিরোধের নানা স্তর উদঘাটিত হয়েছে। 'দেনাপাওনা' (১৯২৩ খৃঃ), 'দত্তা' (১৯২৪ খৃঃ) উপন্যাস দুটিতে প্রেমের বিকাশে মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় তার—প্রধান লক্ষ্য চরিত্রসৃষ্টি। পরিবার জীবনের সাধারণ আবেগ ও বৃত্তি সমূহের সম্বন্ধে এক আশ্চর্য সত্যানুভূতি শরৎচন্দ্রের ছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে, মা যেমন তাঁর নিজের ছেলেকে ভালবাসেন তেমনি সময় সময় পরের ছেলেকেও সমান স্নেহ দেন। দাম্পত্যপ্রেমও তেমনি কোন আদর্শে বাঁধা থাকে না। সেখানেও মান অভিমান, তীব্র মতভেদ, ঘৃণা, অবজ্ঞার আবরণ এর স্বরূপকে দুর্নিরীক্ষ্য করে তোলে। স্নেহ -প্রেমের এই তির্যক গতি পারিবারিক জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করে তা শরৎচন্দ্র খুব সূক্ষ্মভাবে তার উপন্যাসে এঁকেছেন।

তাঁর কাহিনীতে যেমন, ভাষায়ও তেমনি হৃদয়াবেগের প্রাবল্য। রবীন্দ্রযুগেও তিনিই ছিলেন সব চাইতে জনপ্রিয় লেখক। প্রতিটি গল্পে অনেকখানি আবেগের সঞ্চার করেছেন। তিনি বাঙালি চিত্তকে যেভাবে স্পর্শ করেছিলেন, এমন আর কেউ নয়।

রবীন্দ্রযুগে একমাত্র প্রমথ চৌধুরীই নতুন এক গদ্যরীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী। তিনি 'ভলটেয়ার'-এর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর ভাষা লঘু, তীক্ষ্ণ, চোস্ত ছিল। 'হুতোমে'র ভাষা অনেক বেশী কথ্যধর্মী, মুখের ভাষার নিকটস্থ ছিল। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রখর মনীষার কর্ষণে বাংলা গদ্যের চলিতরূপ অন্যভাবে এল। তাঁর নেতৃত্বে ও 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪ খৃঃ) মাধ্যমে কথ্য ভাষার সপক্ষে এক বৃহৎ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তিনি চলতি রীতির সমর্থনে বরাবর সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রামের ধৈর্যই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষা মজলিশি। তর্কের দীপ্তি আছে এ ভাষায়। তাঁর ভাষায় কোথাও ঢিলেঢালা নেই, যেমন—'আঁটসাট সুঠাম দেহ তেমনি উজ্জ্বল মুখশ্রী'। তাঁর রচনায় মননশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রবণতা। কথ্যরীতি ও লেখ্যরীতির অভিন্নতা প্রমাণে তিনি উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইডিয়ম প্রয়োগ করে গদ্যে সাধুভাষার কৃত্রিমতা ঘোচাতে চেয়েছিলেন। প্রবাদ-প্রবচন ভাষার মধ্যে প্রয়োগ করে বক্তব্যের অস্পষ্টতা ঘোচাতে চেয়েছেন। তিনি বাংলা গদ্যে ইংরাজী বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন।

লেখকের চিন্তাশক্তির মৌলিকতায় বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায় 'জয়দেব' প্রবন্ধটিতে। সাধুভাষায় রচিত এই প্রবন্ধটিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে হৃদয়বৃত্তির ছাপের চাইতে বুদ্ধিবৃত্তির ছাপ প্রগাঢ়। তিনি মনে করতেন সাহিত্যের মধ্যে হাসির কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় হয়েছে—বিতর্ক। আবার প্রবন্ধ ছেড়ে যখন গল্প লিখেছেন তখন রচনার চাতুর্যে চমক সৃষ্টি করেছেন।

বক্তব্যকে ঘুরিয়ে উপস্থাপন করা তাঁর গদ্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে অনেক সময় রস ক্ষুন্ন হয়েছে। সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রয়োগ তাঁর ভাষার ধার বাড়িয়েছে। উইট বা বাকবৈদগ্ধ্যের চুমকি বসিয়ে পাঠক মনে চমক লাগিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধে ও ছোটগল্পে প্যারাডক্স ও এপিগ্রাম লক্ষ্য করা যায়।

নানা জাতীয় শব্দের ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা তত্ত্বেও তাঁর ভাষা ভেঙ্গে পড়েনি। শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রভব আছে তাঁর ভাষায়। বুদ্ধির খেলা, শ্লেষ, বক্রোক্তি—বীরবলী রীতিতে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তিনি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুশাসনে না থেকে যদৃচ্ছাচারণ করেন। দীর্ঘ ভূমিকা, অনেক শিথিল সম্পর্কিত প্রসঙ্গ ঘুরে, তবে নির্বাচিত বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছেন। প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য থেকে তাঁর দীপ্ত মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, সাহিত্য ও ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁর মনন কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'সবুজপত্রে'র প্রকাশের আগে প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন বাংলা সাহিত্যের হাওয়া বদলের প্রয়োজন আছে। লেখার ভাষাকে মুখের ভাষার নিকটস্থ করার যে শর্ত অর্থাৎ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান—তা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর অভিজাত মন কথ্যরীতির লৌকিক রূপটি গ্রহণে অক্ষম ছিল। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের হেরফের ঘটিয়ে তাঁর গদ্যকে সাধুরীতির পর্যায়ে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁর চলিত রীতি—কথ্য বাংলা নয়।

'সবুজপত্রে'র পরেই 'কল্লোলে'র আবির্ভাব। 'কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা পূর্ববর্তী লেখকদের প্রতি বিদ্রোহ জানিয়ে নেমেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী লেখকরা সাহিত্যকে উচ্চ সমাজের জন্য তৈরী করেছিলেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা সাহিত্য রচনা করেননি। বিষয়বস্তু এবং ভাষার মধ্যে 'কল্লোল'-গোষ্ঠী নতুনত্ব আমদানি করলেন। গ্রাম্য মানুষের বা শহরের নিম্ন জাতীর মুখের ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করলেন। ফলে ভাষা অনেক জীবন্ত ও সরস হল। লৌকিক জীবন থেকে উদ্ভূত ইডিয়ম তাঁরা সাহিত্যে প্রয়োগ করলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এবং লেখনভঙ্গির নতুনত্ব—বাংলা গদ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করল।

এখানে যে সকল গদ্য শিল্পী অর্থাৎ রামমোহন থেকে যাঁরা বাংলা গদ্যকে লালন করেছেন, তাঁদের সকলের ব্যক্তিত্বের ছাপ বাংলা গদ্যে পড়েছে। প্রত্যেক লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা করে চেনা যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতবর্গের হাতে বাংলা গদ্যের বিকাশ সূচিত হয়েছিল। তারপর বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধু গদ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং চলিত গদ্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহের পথ বেয়ে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীতে উত্তরণ। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের এই ধারাপথে একটি অতি উজ্জ্বল নাম বিনয় সরকার আজও উপেক্ষিত।

—:—